তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে জানতে পেরেছি মাটি হলো উদ্ভিদের অবলম্বন এবং সার হলো তার খাবার। আমরা কি জানি এ সারে কী কী উপাদান থাকে? সার হলো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোর আধার। আর প্রাণীর ক্ষেত্রে শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ লবণ হলো পুষ্টি উপাদানের আধার। অন্যদিকে মাছ ও পশু–পাখির জন্য খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে সম্পূরক খাদ্যের বিকল্প নেই। আবার জমিতে সার হিসেবে জৈব সারের কার্যকারিতা ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার জানা অত্যাবশ্যক।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছ ও পশু–পাখির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- সহজলভ্য উপকরণ (যেমন–বাসাবাড়ির বর্জ্য) ব্যবহার করে জৈব সার তৈরির পদ্ধতি ও এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব;
- বালাইনাশক (জৈব ও অরাসায়নিক) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ–১ : উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু ও পানি থেকে কতগুলো উপাদান শোষণ করে। এ উপাদানগুলোর অভাবে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না। তাই লাভজনকভাবে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো সার হিসেবে প্রয়োগ করে এদের অভাব পূরণ করা হয়। এ উপাদানগুলোকেই উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলে। এ পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাবজনিত লক্ষণ অন্য কোনো পুষ্টি উপাদান দ্বারা পূরণ করা যায় না। তাই এ পুষ্টি উপাদানগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান বলে। এখানে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের শ্রেণিবিভাগ, কাজ, অভাবজনিত লক্ষণ এবং পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পুষ্টি উপাদানের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদের মোট পুষ্টি উপাদান ১৭টি। উদ্ভিদের গ্রহণমাত্রার উপর ভিত্তি করে এ পুষ্টি উপাদানগুলোকে ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

(ক) **মুখ্য পুষ্টি উপাদান :** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৯টি যথা– কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার।

(খ) **গৌণ পুষ্টি উপাদান :** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হয়। গৌণ পুষ্টি উপাদান ৮টি। অল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হলেও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার জন্য এই উপাদানগুলো অত্যাবশ্যক যথা – লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, তামা, দস্তা, বোরন, ক্লোরিন, কোবাল্ট।

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদ ২টি উৎস থেকে ১৭টি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। যথা– (ক) প্রাকৃতিক উৎস ও (খ) কৃত্রিম উৎস।

(ক) **প্রাকৃতিক উৎস :** মাটি, বায়ু ও পানি এ তিনটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস।

মাটি : কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত বাকি ১৪টি পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকে পেয়ে থাকে।

বায়ু : উদ্ভিদ কার্বন ও অক্সিজেন বায়ু থেকে গ্রহণ করে।

পানি : উদ্ভিদ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পানি থেকে পায়। এছাড়াও উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থও গ্রহণ করে।

(খ) **কৃত্রিম উৎস :** জৈব সার ও রাসায়নিক সার হচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের কৃত্রিম উৎস।

জৈব সার : উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সবগুলোই জৈব সারে পাওয়া যায়। গোবর, কম্পোস্ট, আবর্জনা, খড়কুটা ও আগাছা পচিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক সার : ইউরিয়াতে নাইট্রোজেন, টিএসপিতে ফসফরাস, এমওপিতে পটাশিয়াম এবং জিপসামে ক্যালসিয়াম ও সালফারের প্রাধান্য থাকে। এছাড়া জিঙ্ক সালফেটে জিঙ্ক ও সালফার থাকে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সারের নমুনা দিবেন। এ সারগুলো প্রধানত কোন কোন পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে তাদের নাম ও ৩টি করে কাজ লিখিয়ে দলীয়ভাবে উপস্থাপন করাবেন।

পাঠ–২: পুষ্টি উপাদানের কাজ

উদ্ভিদের জীবনচক্রে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন কাজ করে থাকে। নিচে উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুষ্টি উপাদানের কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো–

নাইট্রোজেন : (১) গাছকে ঘন সবুজ রাখে (২) গাছের পাতা, কাণ্ড ও ডালপালার বৃদ্ধি ঘটায় (৩) অধিক কুশি সৃষ্টিতে সহায়তা করে (৪) শিকড় বিস্তারে সহায়তা করে।

ফসফরাস : (১) উদ্ভিদের শিকড় মজবুত করে (২) সময়মতো ফুল ফোটায় ও ফসল পাকায় (৩) ফসলের গুণগত মান বাড়ায়।

পটাশিয়াম : (১) শক্ত ও মজবুত কাণ্ড গঠনে সহায়তা করে (২) উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় (৩) উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ও ফলের বৃদ্ধি সমুন্নত রাখে (৪) গাছের শিকড় বৃদ্ধি করে (৫) দানা জাতীয় শস্যের দানা পুষ্ট করে।

ক্যালসিয়াম : (১) উদ্ভিদের মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে (২) উদ্ভিদকোষকে শক্তি প্রদান করে (৩) ডাল ফসলের ফলন বাড়ায় (৪) ফল জাতীয় শস্যের কাণ্ড শক্ত করে (৫) খাদ্যশস্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ায়।

ম্যাগনেশিয়াম : (১) সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে (২) ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে (৩) চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে (৪) সবুজ রং রক্ষায় সহায়তা করে।

গন্ধক (সালফার) : (১) তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে (২) শিম জাতীয় ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি (নডিউল) উৎপাদনে সাহায্য করে (৩) শিকড় বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদনে সহায়তা করে (৪) গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

দস্তা (জিঙ্ক) : (১) ফুল ও ফল উৎপাদনে সহায়তা করে (২) উদ্ভিদের সবুজ কণিকা (ক্লোরোফিল) গঠনে সাহায্য করে (৩) দানা ও ফলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়ায় (৪) বীজ গঠনে অংশগ্রহণ করে (৫) পেঁয়াজ, মটর প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।

লৌহ (আয়রন) : (১) উদ্ভিদের সবুজ কণিকা (ক্লোরোফিল) গঠন করে (২) বীজ উৎপাদনে সহায়তা করে (৩) ফসলের গুণগত মান বাড়ায় (৪) বাঁধাকপি, শালগম, মুলা ইত্যাদির ফলন বৃদ্ধি করে (৫) শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ও ক্যালসিয়াম নামে দল গঠন করবেন। প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ দলের পুষ্টি উপাদানের কাজ ও তাদেরকে যে যে সারে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দেখানো নমুনা সার/নমুনা উদ্ভিদ প্রদর্শন করে দলীয় কাজটি করতে পারে।

পাঠ–৩ : পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
নাইট্রোজেন	(১) গাছের পাতা হালকা সবুজ থেকে শুরু করে হলুদ বর্ণ ধারণ করে (২) ফলন অনেক কম হয়। (৩) বীজ অপুষ্ট হয় (৪) দানা জাতীয় ফসলের কুশি কম হয় (৫) গাছের শিকড়ের বিস্তৃতি কম হয় (৬) গাছের পাতা আগাম ঝরে পড়ে (৭) বীজের আকৃতি ছোট হয়।
ফসফরাস	(১) বিটপ ও মূলের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (২) কোষ বিভাজনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় (৩) গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না (৪) পাতা কম হয় (৫) আমিষের পরিমাণ কমে যায় (৬) ফুলের সংখ্যা কমে যায় (৭) ফলের আকার ছোট থাকে ও ফল ঝরে যায়।
পটাশিয়াম	(১) উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় (২) পোকা–মাকড়ের আক্রমণ বাড়ে (৩) সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায় (৪) গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় (৫) গাছের পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে (৬) খরা সহ্য করার ক্ষমতাও কমে যায়।

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
সালফার (গন্ধক)	(১) গাছ খর্বাকৃতির হয় (২) পাতা ছোট ও বিবর্ণ হয় (৩) ফসলের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয় (৪) কান্ড শুকিয়ে সরু হয়ে যায় (৫) তেল জাতীয় শস্যের ফলন কমে যায় (৬) ধান গাছের বেলায় নতুন পাতা হলদে হয়ে যায় (৭) গাছের বৃদ্ধি ও কুশির সংখ্যা কমে যায়।
জিংক (দস্তা)	(১) ধান গাছের কচিপাতার গোড়া সাদা হয়ে যায় (২) গাছে ফুল ফুটতে ও ফল ধরতে বিলম্ব হয় (৩) ভুট্টা, তুলা, কমলালেবু ইত্যাদি গাছের পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে বিবর্ণতা দেখা দেয় (৪) পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় (৫) লেবু গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় (৬) জমিতে কোথাও ধানের চারা বড় হয় এবং কোথাও ছোট হয় (৭) উদ্ভিদের মূল ও কান্ডের অগ্রভাগ শুকিয়ে যায়।
আয়রন (লৌহ)	(১) কচি পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয় (২) প্রথমে পাতার দুই শিরার মাঝখানে বিবর্ণ হয়ে সমগ্র পাতায় তা ছড়িয়ে পড়ে (৩) গাছ খর্বাকৃতির হয় (৪) সয়াবিন, কমলালেবু ও সবজি জাতীয় পাতায় পচন ধরে (৫) ধানের বীজতলার চারার নতুন পাতা হলুদ হয়ে যায়।
ক্যালসিয়াম	(১) কচি পাতার অগ্রভাগের গঠন অস্বাভাবিক হয় (২) পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয় (৩) পাতার কিনারায় এবং মাঝখানে হলদে ও বাদামি রং হয় (৪) পাতা ছোট থাকে (৫) গাছ খর্বাকৃতির হয় (৬) ফুল ও ফলের কুঁড়ি ঝরে যায় (৭) শিম জাতীয় ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
ম্যাগনেসিয়াম	(১) পাতার দুই শিরার মধ্যবর্তী এলাকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে (২) পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় (৩) গাছের শাখা ও পাতার বোঁটা সরু হয় (৪) নতুন পাতা হালকা সবুজ, খাটো এবং সরু হয় (৫) শিমের পুরো পাতা হলুদ হয়ে যায় (৬) ক্লোরোফিল উৎপাদন ব্যাহত হয় (৭) গাছের শাখা ও পাতার বোঁটা সরু হয়।

কাজ : শিক্ষক নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিংকের অভাবে উদ্ভিদে বা ফসলে কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায় তার নমুনা স্থিরচিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা উক্ত পুষ্টি উপাদানের অভাব কোন কোন নমুনায় প্রকাশ পেয়েছে এবং লক্ষণগুলো কী কী তা দলীয়ভাবে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ–৪ : গৃহপালিত পশুর পুষ্টি উপাদান

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। দৈহিক বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান থাকা আবশ্যক। গৃহপালিত পশুর খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদান থাকা দরকার। নিচের ছকে পুষ্টি উপাদানের নাম, পুষ্টির উৎস ও পুষ্টির কার্যকারিতা দেখানো হলো –

পুষ্টি উপাদান	পুষ্টির উৎস	পুষ্টির কার্যকারিতা
আমিষ	ডাল, খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, রক্ত	(১) দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে সহায়তা করে (২) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।
শর্করা	গম, ভুট্টা, খড়, চালের কুঁড়া, ঝোলা গুড়	(১) দেহে শক্তি বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে (২) দেহের বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বাড়ায় (৩) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
চর্বি বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ	খৈল, সয়াবিন, বাদাম, সূর্যমুখী, দুধ, মাছের তেল	(১) দেহে তাপ ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে (২) চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধি করে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
ভিটামিন	বিভিন্ন কাঁচা ঘাস, ফলমূল, শাকসবজির খোসা, গাছের পাতা	(১) চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন ডি সহায়তা করে (২) ভিটামিন এ রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।
খনিজ পদার্থ (ফসফরাস, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা, লৌহ, ম্যাংগানিজ, কপার ও কোবাল্ট)	কাঁচা ঘাস, লবণ মিশ্রিত উদ্ভিদজাত খাদ্য	(১) দেহে নতুন টিস্যু উৎপাদনে সহায়তা করে (২) হাড়, দাঁতের গঠন ও পুষ্টি সাধন করে (৩) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
পানি	পুকুর, খাল, বিল, নদী, গভীর ও অগভীর নলকূপের পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি, রসাল কাঁচা ঘাস	(১) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে (২) খাদ্যকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে (৩) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে (৪) দেহের দূষিত পদার্থ মলমূত্র ও ঘামের আকারে বের করে দেয়।

গৃহপালিত পশুর সুষম পুষ্টি উপাদান

উপরে আলোচিত পুষ্টি উপাদানগুলো আনুপাতিক হারে যেসব খাদ্যে বিদ্যমান থাকে, তাকে সুষম পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য বা সুষম খাদ্য বলে। এ খাদ্য গবাদিপশুর জন্য খুবই জরুরি। এ খাদ্য সকল পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে। এটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হয়ে থাকে। এতে আঁশ জাতীয় খাদ্য (শুষ্ক ও রসাল) এবং দানাদার খাদ্য থাকে।

আঁশ জাতীয় পুষ্টি উপাদান : (ক) **শুষ্ক** : ধানের খড়, গমের খড়, সাইলেজ ও ঘাস

(খ) **রসাল** : কাঁচা ঘাস, মিষ্টি আলু, মুলা, গাজর ইত্যাদি

দানা জাতীয় খাদ্য : গম ভাঙা, ভুট্টা ভাঙা, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, খৈল, ডালের খোসা ।

কাজ : অপুষ্টিতে ভুগছে এমন গৃহপালিত পশু এবং সঠিক পুষ্টিসম্পন্ন সুস্থ গৃহপালিত পশুর স্থিরচিত্র বা ভিডিও শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে এ দুই ধরনের গৃহপালিত পশুর শারীরিক গঠন ও সুস্থতার পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলবেন। এ কাজটি উক্ত আলোচনা বা দলীয়ভাবে শিক্ষক করাতে পারবেন।

পাঠ–৫ : গৃহপালিত পাখির পুষ্টি উপাদান

অন্যান্য প্রাণীর মতো গৃহপালিত পাখির জন্যও ৬টি পুষ্টি উপাদান জরুরি। এখানে পুষ্টি উপাদানগুলোর উৎস এবং আরও কিছু কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. শর্করা

উৎস: শর্করার উৎসগুলো হলো গমের ভুসি, ভুট্টা ভাঙা, চালের খুদ ও কুঁড়া ইত্যাদি

কাজ : (১) ভুট্টা ভাঙা খেলে ডিমের কুসুম হলুদ হয়। (২) দেহে শক্তি বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে । (৩) দেহের বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বাড়ায় । (৪) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

২. আমিষ

উৎস: আমিষের উৎসগুলো হলো খৈল (বাদাম, তিল), ডালচূর্ণ, সয়াবিন চূর্ণ, শুষ্ক গুঁড়া (শুঁটকি মাছ, পশুর নাড়িভুঁড়ি, হাড়ের গুঁড়া, রক্ত, শামুক, ঝিনুক, ছোট মাছ) ইত্যাদি।

কাজ : (১) দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে সহায়তা করে ।(২) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।

৩. চর্বি/তৈল

উৎস: উৎসগুলো হলো তৈল জাতীয় শস্য, খৈল ইত্যাদি।

কাজ : (১) দেহে তাপ ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।(২) চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধি করে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৪. ভিটামিন

উৎস: উৎসগুলো হলো পালংশাক, পুঁইশাক, লেটুস, মুলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মাছের উপজাত, সবুজ ঘাস ইত্যাদি।

কাজ : (১) ডিমের উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। (২) চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন ডি সহায়তা করে।(৩) ভিটামিন এ রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৫. খনিজ পদার্থ

উৎস: উৎসগুলো হলো মাংসের উচ্ছিষ্ট, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, শামুক ও ঝিনুক চূর্ণ, লবণ, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি।

কাজ : (১) ডিমের খোসা তৈরিতে সাহায্য করে। (২) দেহে নতুন টিস্যু উৎপাদনে সহায়তা করে (৩) হাড়, দাঁতের গঠন ও পুষ্টি সাধন করে । (৪) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৬. পানি

উৎস: উৎসগুলো হলো সরবরাহকৃত পানি, কচি ঘাস, শাকসবজি।

কাজ : ১) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। (২) খাদ্যকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে।(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।(৪) দেহের দূষিত পদার্থ মলমূত্র ও ঘামের আকারে বের করে দেয়।

উল্লেখ্য যে ঝিনুক, শামুক, ছোট মাছ, কাঁকড়া, কেঁচো, পোকামাকড়, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি হাঁসের প্রিয় খাদ্যবস্তু।

গৃহপালিত পাখির সুষম পুষ্টি উপাদান : খাদ্য গ্রহণ করে প্রতিটি জীব বেঁচে থাকে। কিন্তু এ খাদ্যে মাত্র একজাতীয় পুষ্টি উপাদান থাকলে এদের বৃদ্ধি ভালো হয় না। তাই জীবের জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকল পুষ্টি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টি উপাদানগুলোর একটির অভাব অন্যটি দ্বারা পূরণ সম্ভব নয়। সুষম মাত্রায় পুষ্টি উপাদানগুলো খাওয়ালে হাঁস-মুরগি থেকে মানসম্মত ডিম ও মাংস পাওয়া যায়। হাঁস মুরগির সুষম খাদ্যে উপরে উল্লিখিত সকল পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। তাই এ খাদ্য হাঁস-মুরগির জন্য খুবই প্রয়োজন।

পাঠ– ৬ : সম্পূরক খাদ্য

আমরা জেনেছি উদ্ভিদ তাদের পুষ্টি উপাদানগুলো মাটি, পানি ও বায়ু থেকে গ্রহণ করে থাকে। এ উপাদান গুলোর অভাব হলে আমরা জমিতে সার প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু মাছ ও পশু পাখি কোথা থেকে তাদের পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে ? উত্তরে বলব আঁশ জাতীয় খাবার ও দানাদার খাদ্য থেকে। কিন্তু এ খাবার খাওয়ার পরও মাছ, পশু পাখি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। তাই মাছ ও পশু পাখি থেকে দ্রুত ও অধিক উৎপাদন পেতে প্রচলিত খাবারের পাশাপাশি প্রতিদিনই কিছু অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এ খাদ্যই হলো সম্পূরক খাদ্য।

মাছের সম্পূরক খাদ্য : শুধু প্রাকৃতিক খাদ্যে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। সার প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দিলে তাতেও মাছের পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না। অধিক উৎপাদন পেতে হলে পুকুরে প্রতিদিন নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এজন্য পুকুর থেকে জাল টেনে ৩০–৪০টি মাছ ধরে গড় ওজন বের করে পুকুরের সব মাছের আনুমানিক মোট ওজন নির্ণয় করতে হবে। বড় মাছের

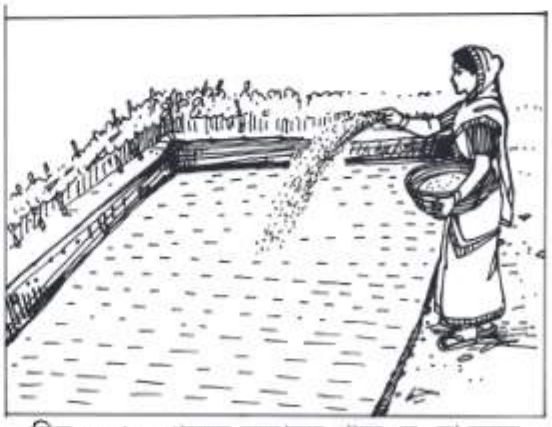

চিত্র–৩.১ : পুকুরে সম্পূরক খাদ্য দেওয়া হচ্ছে

জন্য পুকুরে অবস্থিত মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩–৫ ভাগ হারে প্রতিদিন খাবার দেওয়া উচিত। অর্থাৎ কোনো পুকুরে সব মাছের মোট ওজন ১০০ কেজি হলে ঐ পুকুরে দৈনিক ৩–৫ কেজি হারে খাবার দিতে হবে। আর পোনা মাছকে দেহের ওজনের শতকরা ৫–১০ ভাগ হারে প্রতিদিন খাবার দেওয়া প্রয়োজন।

কার্প জাতীয় মাছের জন্য : কার্প জাতীয় মাছ যেমন– রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ইত্যাদি চাষের ক্ষেত্রে ফিশমিল, চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, আটা ও ভিটামিন, খনিজ মিশ্রণ একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করা যায়। এজন্য খৈল ১২ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভিজা খৈল, ফিশমিল, কুঁড়া এবং আটা একত্রে মিশিয়ে ছোট ছোট বলের মতো বানিয়ে পুকুরে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় মোট খাবার দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে অন্য ভাগ বিকালে দিতে হয়। প্রতিদিন একই সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য দিতে হয়। এতে মাছের খাদ্য গ্রহণে সুবিধা হয়।বড় মাছ ও পোনা মাছের জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকায় ব্যবহৃত উপাদান ও পরিমাণ ছক আকারে দেখানো হলো।

কার্প জাতীয় মাছের জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকা

উপাদান	বড় মাছ	পোনা মাছ
ফিশমিল	১০ কেজি	২১ কেজি
চালের কুঁড়া	৫৩ কেজি	২৮ কেজি
সরিষার খৈল	৩০ কেজি	৪৫ কেজি
আটা	৬ কেজি	৫ কেজি
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১ কেজি	১ কেজি
মোট	১০০ কেজি	১০০ কেজি

চিংড়ির জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকা

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া বা গমের ভুসি	৫০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৫০ গ্রাম
শুঁটকির গুঁড়া/ফিশমিল	২৫০ গ্রাম
শামুক–ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া	৯৫ গ্রাম
লবণ	৩ গ্রাম
ভিটামিন মিশ্রণ	২ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে চিংড়ি চাষের জন্য ১০ কেজি সম্পূরক খাদ্যের ১টি তালিকা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।

পাঠ–৭ : পশুর সম্পূরক খাদ্য

আমাদের দেশে খড়, ভুসি, কুঁড়া, চাল, গম, খৈল, গাছের পাতা, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলো সুষমভাবে খাওয়ানো হয় না এজন্য গবাদিপশু থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই গবাদিপশুকে সম্পূরক খাদ্য দেওয়া হয়। শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও পানি এ ৬টি উপাদান বিবেচনায় রেখে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে জন্মায় এমন কিছু ঘাস যেমন- ইপিল ইপিল, নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি ইত্যাদি এবং খেসারি, কাউপি, মাষকলাই, ভূট্টা প্রভৃতি পশুকে খাওয়ানো হয়। প্রতিটি গাভীকে নিম্নোক্ত হারে দৈনিক সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে-

উপাদান	পরিমাণ
সবুজ কাঁচা ঘাস	১৫–২০ কেজি
শুকনা খড়	৩–৫ কেজি
দানাদার খাদ্য মিশ্রণ	২–৩ কেজি
লবণ	৫৫–৬০ গ্রাম

দানাদার খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রথম ৩ লিটার দুধের জন্য ২ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে। পরবর্তী প্রতি ৩ লিটার দুধের জন্য ১ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে। যদি গরুকে শুধু সবুজ ঘাস ও খড় খাওয়ানো হয় তবে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি ঘাস এবং ১ কেজি খড় দিতে হবে। আবার শুধু ঘাস খাওয়ালে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৬ কেজি ঘাস দিতে হবে। শুধু খড় খাওয়ালে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি খড় দিতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য হিসেবে দানাদার খাদ্য মিশ্রণ–

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া	২ কেজি
গমের ভুসি	৫ কেজি
ভুট্টা ভাঙা	১.৮ কেজি
তিল বা বাদামের খৈল	১ কেজি
লবণ	১০০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	১০০ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে ২ কেজি দানাদার খাদ্য তৈরি করার কৌশল পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলবেন।

পাঠ–৮ : মুরগির সম্পূরক খাদ্য

বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবেশে ছাড়া অবস্থায় যেসব হাঁসমুরগি পালা হয় সেগুলো নিজেরা যতটুকু সম্ভব খাবার খায় এবং এদেরকে শুধু চালের কুঁড়া সরবরাহ করা হয়। এতে হাঁস–মুরগি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এছাড়া খামারে খাবার উপযুক্ত মাত্রায় সরবরাহ না করলেও হাঁস–মুরগি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে হাঁস–মুরগি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন যেমন– ডিম, মাংস পাওয়া যায় না। এজন্য এদেরকে ৬টি পুষ্টি উপাদান (শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ, পানি) সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এটাই হাঁস–মুরগির সম্পূরক খাদ্য। সম্পূরক খাদ্যে দানা জাতীয় ও আঁশ জাতীয় খাদ্য রাখতে হয়। নিচে বাড়ন্ত মুরগির সম্পূরক খাদ্যের তালিকা দেখানো হলো :

৮–১৬ সপ্তাহ বয়সের বাড়ন্ত মুরগির জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকা

উপাদান	পরিমাণ
গম ভাঙা	৫০ ভাগ
গমের ভুসি	১০ ভাগ
চালের কুঁড়া	১৬ ভাগ
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৯ ভাগ
তিলের খৈল	১২ ভাগ
ঝিনুকের গুঁড়া	২.৫ ভাগ
লবণ	০.৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে বাড়ন্ত মুরগির জন্য ১ কেজি সম্পূরক খাদ্য তৈরি, খাদ্য উপকরণ ও পরিমাণসহ একটি পোস্টার তৈরি করতে বলবেন।

পাঠ–৯ : জৈব সার

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে সারের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন জৈব সার সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জানব। জৈব সার ব্যবহারে-

(১) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। (২) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণের উন্নতি হয়।(৩) মাটিস্থ অণুজীবের কার্যাবলি বৃদ্ধি পায়। (৪) মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।(৫) মাটি থেকে পুষ্টির অপচয় কম হয়। (৬) মাটির উর্বরতা বাড়ে। (৭) মাটির সংযুক্তির উন্নতি হয়। (৮) ফসলের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।(৯) মাটির পরিবেশ উন্নত হয়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে 'জৈব সার ব্যবহারের উপকারিতা' বিষয়ে শ্রেণিতে লিখতে দিবেন এবং দলগতভাবে তা উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করবেন।

এবার আমরা জৈব সার হিসেবে কম্পোস্ট সার, সবুজ সার ও খৈল তৈরি নিয়ে আলোচনা করব।

কম্পোস্ট তৈরি : গবাদিপশুর মলমূত্র, খাবারের উচ্ছিষ্ট, খড়কুটা, বিভিন্ন প্রকার কৃষিবর্জ্য, আগাছা, কচুরিপানা প্রভৃতি খামার প্রাঙ্গণে স্তরে স্তরে সাজিয়ে অণুজীবের সাহায্যে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয়, তাকে কম্পোস্ট সার বলা হয়। কাজেই অনেকগুলো জিনিস একত্রে পচিয়ে বা কখনো কখনো একটিমাত্র উপাদান দ্বারাও কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। দুটি পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। যথা– স্তূপ পদ্ধতি ও পরিখা পদ্ধতি।

এখানে আমরা পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি সম্পর্কে জানব।

পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি : পরিখা পদ্ধতিতে সারা বছর কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে সার তৈরির নিয়মাবলি–

১. (ক) প্রথমে একটি উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে (খ) নির্বাচিত স্থানে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ ও ১.২ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পরিখা খনন করতে হবে (গ) এভাবে ৬টি পরিখা পাশাপাশি খনন করতে হবে (ঘ) পরিখার উপর চালার ব্যবস্থা করতে হবে (ঙ) পাঁচটি পরিখা আবর্জনা, খড়কুটা, লতাপাতা, গোবর দিয়ে পর্যায়ক্রমে স্তূপাকারে সাজাতে হবে এবং একটি পরিখা খালি থাকবে (চ) প্রতিটি পরিখার আবর্জনার স্তূপ ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০ সেমি উঁচু হবে (ছ) চার সপ্তাহ পর নিকটবর্তী পরিখার কম্পোস্ট খালি পরিখায় স্থানান্তর করতে হবে (জ) এভাবে কম্পোস্টের উপাদানগুলো ওলটপালট করতে হবে। ফলে উপাদানগুলোর পচনক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে।

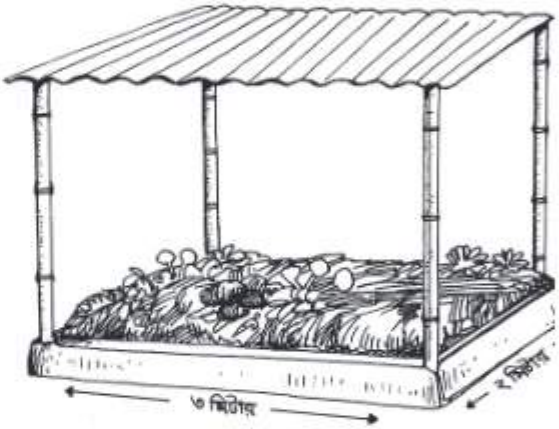

চিত্র–৩.২ পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

২. ২–৩ মাসের মধ্যে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ পচে কম্পোস্ট তৈরি হবে।

কম্পোস্ট সারের উপকারিতা : কম্পোস্ট সার ব্যবহারে–

(১) মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় (২) মাটিতে পুষ্টি উপাদান যুক্ত হয় (৩) মাটিস্থ পুষ্টি উপাদান সংরক্ষিত হয় (৪) মাটির সংযুক্তির উন্নয়ন ঘটে (৫) মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়ে (৬) মাটিস্থ অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

পাঠ–১০ : সবুজ সার তৈরি

জমিতে যেকোনো সবুজ উদ্ভিদ জন্মিয়ে কচি অবস্থায় চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে সবুজ সার বলে। ধইঞ্চা, গোমটর, বরবটি, শন, কলাই এসব ফসল দ্বারা এ সার তৈরি করা যায়।

১. প্রথমে এসব ফসলের যেকোনো একটি জমিতে চাষ করতে হবে। ফুল আসার আগে তা মই দিয়ে মাটির সাথে মেশাতে হবে।

২. তারপর আরও ৩–৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ওলটপালট করে মাটির সাথে ভালোভাবে মেশালে ২ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পচে যায়।

৩. সবুজ সার যেখানে তৈরি হয় সেখানেই ব্যবহৃত হয়।

সবুজ সার হিসেবে ধইঞ্চা চাষ ও সার প্রস্তুতি

১. যেকোনো জমিতে ২/৩ টি চাষ দিতে হবে।

২. চাষকৃত জমিতে প্রতি শতকে ৭০ গ্রাম ফসফেট ও ৫০ গ্রাম পটাশ ছিটাতে হবে।

৩. তারপর প্রতি শতকে ২০০ গ্রাম করে ধইঞ্চা বীজ বপন করতে হবে।

৪. বীজ বপনের প্রায় আড়াই মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসা শুরু করবে।

চিত্র-৩.৩ : ধইঞ্চা চাষ

৫. এ সময় লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ দিয়ে গাছগুলো মাটির নিচে ফেলতে হবে। গাছ লম্বা হলে কাস্তে বা দা দিয়ে কেটে ছোট করে জমি চাষ করতে হবে।

সবুজ সারের উপকারিতা : সবুজ সার ব্যবহারে–

১. মাটির উর্বরতা বাড়ে।

২. মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ হয়।

৩. মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৪. মাটিস্থ অণুজীবের কার্যাবলি বৃদ্ধি পায়।

৫. মাটিস্থ পুষ্টি উপাদান সংরক্ষিত হয়।

৬. মাটির জৈবিক পরিবেশ উন্নত হয়।

খৈল তৈরি : তেল বীজ হতে তেল বের করে নেওয়ার পর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে খৈল বলে। সার ও গোখাদ্য হিসেবে খৈল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রকম তেলবীজ থেকে বিভিন্ন রকমের খৈল পাওয়া যায়। যেমন– তুলা বীজের খৈল, সরিষার খৈল, বাদামের খৈল, তিলের খৈল, নিমের খৈল, তিসির খৈল ইত্যাদি। এ ধরনের সারে নাইট্রোজেন বেশি থাকে। এ সার ভালোভাবে গুঁড়া করে জমিতে ব্যবহার করতে হয়।

কাজ–১ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কিছু পরিমাণ কম্পোস্ট সার নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে উক্ত সারগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাগান বা টবে তাদের দ্বারা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োগের নিয়মাবলি শিখিয়ে দিবেন।

কাজ–২ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির চিহ্নিত চিত্র ও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি পোস্টার তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষক সেগুলো মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ–১১ : জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশকের পরিচিতি

রাসায়নিক বালাইনাশককে বলা হয় নীরব ঘাতক। বালাইনাশক তিন প্রকার-জৈব, অরাসায়নিক এবং রাসায়নিক। রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগে পরিবেশের চরম ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি কোনোভাবেই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। রাসায়নিক বালাইনাশক মাত্রই বিষ। বিষ প্রয়োগে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় তাও বিষমুক্ত নয়। বিষ শব্দটা যেমন আতঙ্কের তেমনি তার ভয়াবহতাও মারাত্মক। কাজেই পরিবেশকে বাঁচাতে এবং বিষমুক্ত ফসল ফলানোর জন্য জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা উচিত। যেসব বালাইনাশক বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের রস/নির্যাস, প্রাণিজ উপজাত এবং বিভিন্ন জৈবিক কলাকৌশল থেকে তৈরি করা হয় তাদেরকে জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক বলে। এসো আমরা জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক সম্পর্কে জানি।

(ক) জৈব বালাইনাশক

১. অ্যালামান্ডা গাছের নির্যাস ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২. রসুনের নির্যাস ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৩. নিমের নির্যাস (বাকল, পাতা, ফুল ও ফল) জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শুকনা নিমপাতার গুঁড়া বীজ ফসল/গুদামজাত শস্যের সাথে মিশ্রিত করে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নিমের তেল ও খৈল ফসলের মূলের কৃমিনাশক। যেমন : নিমবিসিডিন।

৪. তামাক পাতার নির্যাস 'নিকোটিন সালফেট' ব্যবহার করে ফসলের কান্ড বা পাতায় কীটপতঙ্গের আক্রমণ রোধ করা যায়।

৫. মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি ফসলের মাটিবাহিত রোগ দমন করা যায়।

৬. সুগারবিটের শিকড় থেকে আহরিত লাইমো ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি উদ্ভিদের মাটিবাহিত 'ড্যাম্পিং অফ' রোগ দমনে একটি কার্যকরি ব্যাকটেরিয়াম। এটি পোষক উদ্ভিদ, যেমন– পালংশাক ও সুগারবিটের শিকড়াঞ্চলে যুক্ত হয়ে কলোনি তৈরি করে এবং জীবাণুনাশক এন্টিবায়োটিক নিঃসরণের মাধ্যমে উদ্ভিদ রোগ দমন করে থাকে।

৭. ট্রাইকোডারমা জাতীয় প্রজাতি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৮. বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সার প্রয়োগ করে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(খ) **অরাসায়নিক বালাইনাশক**

১. ধানের পাতার লালচে রেখা রোগমুক্ত করতে হলে ধানের বীজ ৫৪° সে. তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্যাকটেরিয়া জনিত বীজবাহিত এ রোগ দূর করা যায়।
২. জাব পোকা দমনে লেডিবার্ড বিটল পোকা ডাল ও তেল জাতীয় ফসলে বৃদ্ধি করা যায়।
৩. ফসলের ক্ষতিকর পোকা দমনে প্রেইং ম্যানটিড এর সংখ্যা বাড়ানো যায়।
৪. ডালিম ফলের চারদিকে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে ডালিমকে পোকা আক্রমণ করতে পারে না।
৫. জমিতে সুষম সার ব্যবহার করলে পোকামাকড় ও রোগজীবাণু অনেক কম হয়।
৬. পোকার আশ্রয়স্থল হলো আগাছা। কাজেই জমি থেকে সবসময় আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।
৭. আলোর ফাঁদ পেতে পূর্ণ বয়স্ক পোকা মেরে ফেলা যায়।
৮. হাতজাল ব্যবহার করে পোকা ধরে ফেলা যায়।
৯. জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে পাখি বসিয়ে পোকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১০. ধান ক্ষেতে মাছের চাষ করা যায়।
১১. ফসল সংগ্রহের পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
১২. কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন ও টমেটোর ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রোগ দমন করা যায়।
১৩. ফেরোমোন ও মিষ্টি কুমড়ার ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন করা যায়।
১৪. মেহগনি ফল থেকে সংগৃহীত নির্যাস ও তেল ভেষজ কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করা হয়।
১৫. পরভোজী পোকা যেমন– নেকড়ে মাকড়সা, ঘাসফড়িং, ড্যামসেল মাছি, মিরিডবাগ ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১৬. জমিতে ব্যাঙের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে রাসায়নিক ও অরাসায়নিক বালাইনাশকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখতে বলবেন।

পাঠ–১২ : কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের কুফল

ব্যাপকভাবে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের কারণে কৃষিতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশি হয়। কৃষিতে এর অসুবিধা বা ক্ষতিকর দিকগুলো হলো–

১. দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শস্য ক্ষেতে বালাই বা কীটপতঙ্গ বালাইনাশককে বাধাদানের ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে ঐ বালাইনাশক দিয়ে আর নির্দিষ্ট কীট বা বালাইকে ধ্বংস করা যায় না।

২. অধিকাংশ কীটনাশক প্রাকৃতিক শিকারি জীব ও মৃত্তিকার উপকারী অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে।

৩. শস্য ক্ষেতে প্রয়োগকৃত কীটনাশক ও বালাইনাশকের খুব সামান্য অংশ (১% বা এর কাছাকাছি) কাঙ্ক্ষিত কীট বা বালাইয়ের কাছে পৌছাতে পারে।

৪. প্রয়োগকৃত রাসায়নিক বালাইনাশকের একটি বড় অংশ বাতাসে, ভূপৃষ্ঠের পানিতে, ভূগর্ভস্থ পানিতে অনুপ্রবেশ করে এবং জীবের খাদ্যচক্রে ঢুকে পড়ে।

৫. বালাইনাশক মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস করে।

৬. রাসায়নিক বালাইনাশক জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে।

৭. রাসায়নিক বালাইনাশক সার্বিকভাবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

কাজ–১ : সম্ভব হলে শিক্ষক কীটপতঙ্গ দমনে খাদক পোকামাকড় ব্যবহার, হরমোন ফাঁদ, আলোর ফাঁদ ও রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার ভিডিও/ছবি/পোস্টার নমুনার সাহায্যে দেখাবেন।

কাজ–২ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে 'রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের কুফল' বিষয়ে পোস্টার পেপার অঙ্কন করতে বলবেন অথবা লিখতে বলবেন।

অথবা

কাজ–১ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপকারী বা ক্ষতিকর পোকাখাদক পাখি ও পোকার নামের একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। এ কাজটি শিক্ষক দলীয়ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবেন।

কাজ–২ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক সংগ্রহ করে জমা দিতে বলবেন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানগুলোকে ..... শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

২. ..... উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৩. গৃহপালিত পশু খাদ্যে ..... পুষ্টি উপাদান থাকা দরকার।

৪. ..... পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	ডাল, খৈল, শুঁটকি গুঁড়া	আঁশ জাতীয় পুষ্টি উপাদান
২.	নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম	কৃত্রিম উৎস
৩.	জৈব ও রাসায়নিক সার	পুষ্টি উপাদান
৪.	কাঁচা ঘাস, মুলা, গাজর	আমিষ
		শর্করা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান বলতে কী বোঝ?

২. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের উৎস কয়টি ও কী কী?

৩. সম্পূরক খাদ্য বলতে কী বোঝ?

৪. সবুজ সার কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সবুজ সারের উপকারিতা বর্ণনা কর।

২. বালাইনাশক বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকার বালাইনাশকের বর্ণনা দাও।

৩. কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ কর।

৪. উদ্ভিদের জীবনচক্রে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৫. কম্পোস্ট সার বলতে কী বোঝ? কম্পোস্ট সার তৈরির পরিখা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কয়টি?

ক. ১১ খ. ১৪
গ. ১৭ ঘ. ২০

২. উদ্ভিদে কার্বন ও হাইড্রোজেন ঘাটতি পূরণে প্রয়োজন–

i. পানি
ii. মাটি
iii. বায়ু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সালমা নতুন মুরগি চাষি, সে ডিম উৎপাদনের জন্য বাজার থেকে ১৮ টি মুরগি ও ৬ কেজি মুরগির খাদ্য কিনে আনে।কিন্তু দু'দিন পর সে লক্ষ করল মুরগির ডিমের খোসাগুলো বেশ নরম প্রকৃতির, ফলে সে বিচলিত হয়ে পড়ে।

৩. ন্যূনতম হারে খাদ্য খাওয়ালে সালমা ক্রয়কৃত খাদ্য মুরগিগুলোকে কয়দিন খাওয়াতে পারবে?

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

৪. সালমার মুরগির ডিম উৎপাদনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য খাদ্যে যোগ করতে হবে–

ক. খৈল খ. ডাল চূর্ণ
গ. ভুট্টা ভাঙা ঘ. লবণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সরদারপাড়া গ্রামের কৃষক হাফিজ ২০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ শুরু করে লক্ষ করলেন ধান চারার কুশি আশানুরূপ হারে গজাচ্ছে না এবং জমিতে পোকামাকড় দেখা যাচ্ছে। চিন্তিত হাফিজকে বিভিন্নজন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দিলেও তিনি সেটি গ্রহণ করেননি। ফলে প্রথম দফায় সে সফল না হলেও পরের বছর জৈব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে তিনি ঐ জমি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেন।

ক. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলতে কী বোঝ?

খ. পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে একটি পরিখা ফাঁকা রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রথম দফায় কী ধরনের জৈব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে হাফিজ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারতেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. হাফিজের দ্বিতীয় বারের চাষ ব্যবস্থাপনা শুধু পুষ্টি ঘাটতি পূরণই নয় রোগবালাই দমনেও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে– মূল্যায়ন কর।

২. আহাদ সাহেব দ্বিতীয় বারের মতো বাড়ির পাশের পতিত জমিটি চাষের জন্য ঠিক করে বেগুনের চারা রোপণ করলেন। চারাগুলো বড় হলে ফুল ও ফল আসে। কিন্তু এক সময় জমির অধিকাংশ বেগুন গাছের কাণ্ডে ও ডগায় বিভিন্ন রকমের পোকার উপস্থিতি দেখা যায় আর কিছু কিছু বেগুনে ছোট কালো ছিদ্র লক্ষ করা যায়। গত বছর এই একই পরিস্থিতিতে তিনি কীটনাশক প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু কোনো উপকার পাননি বরং অর্থের অপচয় হয়েছে। তাই এবার তিনি বিকল্প উপায় খুঁজতে কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করেন।

ক. পরিবেশকে বাঁচাতে কী ধরনের বালাইনাশক ব্যবহার করতে হয়?

খ. কী কারণে বালাইনাশককে নীরব ঘাতক বলা হয় ব্যাখ্যা কর।

গ. আহাদ সাহেবের সবজি ক্ষেতের সমস্যা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা কর।

ঘ. প্রথম বার সবজি ক্ষেতে আহাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল মূল্যায়ন কর।